Aslaf Academy

লেকচার ২৫ : ঘরের কাজ ও সেবকদের সাথে নবীজি ﷺ

কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

ইন্সট্রাক্টর: আহমাদুল্লাহ আল – জামি।

লেকচার ২৫ : ঘরের কাজ ও সেবকদের সাথে নবীজি (সঃ)।

নবীজি ﷺ নিজের কাজ নিজেই করতেন

ঘরের কাজ পরের কাজ নয়, নিজের কাজ। যে সংসার নিজের, তার কাজও নিজের। আমরা এগুলো মুখে বলি, কাগজে লিখি। কিন্তু প্রায়োগিক জীবনে আমরা এসবে নিজেদের অভ্যস্ত করি না। অথচ, ৩ বেলা আহার, নিয়ম করে গোসল, জামা-কাপড় পাল্টানো—এসব কাজের ব্যাপারে আমাদের যেমন কোনো কষ্ট থাকে না, ঠিক সেভাবে ঘর-গেরস্থালির কাজেও আমাদের কষ্ট থাকা উচিত নয়।

আমাদের নবীজিকে অনায়াসে ঘরের কাজে পাওয়া যেতো। এমন নয় যে, হঠাৎ একদিন তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন; বরং সবসময়ই তিনি ঘরের কাজ করতেন। নিজের কাজ মনে করে করতেন।

আসওয়াদ রা. বলেন, ‘আমি আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবীজি ঘরে কী করেন? আয়েশা রা. বলেন, ঘরের কাজবাজে ব্যস্ত থাকেন। যখন নামাযের সময় হয়, নামায পড়তে যান।’ (সহিহ বুখারি, হা. ৬৭৬)

এখানে লক্ষ্যণীয়, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী করেন?'

এই প্রশ্নের জবাবে আয়েশা রা. বিশেষ কোন কাজের কথা বলেননি; বরং তিনি খুব সাদামাটাভাবে জানিয়েছেন নবীজি ঘরে এসে কাজ করেন। আয়েশা রা.-এর এই জবাবের মাধ্যমে বোঝা যায়, নবীজি ঘরের কাজে কতটা স্বাভাবিক ও নিয়মিত ছিলেন।

আয়েশা রা. আরও বলেছেন, ‘তিনি নিজ হাতেই জুতা ও জামা সেলাই করতেন। তিনি তো তোমাদের মতোই মানুষ। তিনি কাপড়ে তালি লাগান। বকরির দুধ দোহান আর নিজের যত্ন নেন।’ (সুনানে তিরমিযি, হা. ৩৪৩)

একবার তাঁর কাছে কিছু লোক মুসলমান হলে তিনি তাদের বললেন, ‘মানুষের কাছে কিছু চেয়ো না।’

প্রথমে এই নসিহতটি শোনার পর আমাদের মাথায় চাওয়ার প্রসঙ্গ হিসেবে টাকা-পয়সা বা অন্য কোনো বৈষয়িক বিষয়ের কথাই মনে পড়ে, কিন্তু নবীজির কথা আমাদের চেয়ে সাহাবায়ে কেরামই ভালো বুঝতেন। যিনি এই ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'উপস্থিত সাহাবীদের একজনের হাত থেকে তাঁর ঘোড়ার চাবুক পড়ে গেলো; তিনি কাউকে তা তুলতে না বলে নিজেই তুলে নিলেন। চাওয়া’র প্রাসঙ্গিকতা যে কত দূর বিস্তৃত সাহাবীর এই আমল দেখে তা বোঝা যায়।

এসব বর্ণনা দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য যে, আমরা প্রত্যেকেই নিজের কাজকে নিজের ভাববো ও করবো, তখন আমাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা আসবে, আসবে স্বাবলম্বিতা। কিন্তু বর্তমান যে পরিবেশে আমরা জীবন কাটাই, তাতে অলিখিত নিয়মের মতো ঘরের এক দু'জনই সকলের কাজ করে, এতে যেমন তাদের উপর জুলুম হতে থাকে, অন্যদিকে নষ্ট হতে থাকে অনেকগুলো মানুষের আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার মতো মূল্যবান নেয়ামত।

পুরো উম্মতকে শেখানোর জন্যই নবীজি ঘরের, বাইরের সব কাজকে নিজের কাজই ভাবতেন এবং নিজেই তা করতেন।

দাস-দাসীর ব্যাপারে নবীজির ﷺ আদর্শ।

নবীজির যুগে আরব-অনারব সর্বত্রই দাসপ্রথা ছিল। তখনকার দাস মানে ছিলো একজন মানুষের কাছে অর্থের বিনিময়ে অধীনস্থ হয়ে থাকা। এই অধীনস্থতা যদি শুধু কাজ-কর্ম বা খাটুনির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে এতে অন্যায় কিছু ছিলো না; বরং তা সীমা ছাড়িয়ে অনেক অন্যায়ের পথ উন্মোচন করেছিল। নবীজি দাসদের এই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি দাসদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অধিকার। শরীয়তে দাসদের সাথে ব্যবহারের বিধি নির্ধারণ করেছিলেন। তাদের উপর অন্যায় হলে একমাত্র কাফফারা রেখেছিলেন তাদের মুক্তি বা আজাদ করে দেয়াকে।

নবীজিরও দাস ছিলো। কিন্তু তাঁরা নিজেদের দাস মনে করতেন না। রাসূলের কোনো আচরণ তাঁদেরকে দাস ভাবতে সুযোগ দিতো না। তাঁরা ছিলেন নবীজির সন্তানের মতো। তাঁদের সকল অভাব-অভিযোগ, দরকার, প্রয়োজন তিনি নিজে তদারকি করে ঠিক করে দিতেন। তাঁদের সংসারের ব্যবস্থা করতেন। তাঁদের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ ভাবতেন এবং তা উদযাপন করতে ও লাঘব করতে গিয়ে তাঁকে একজন পিতার মতো সুখী ও সক্রিয় দেখা যেতো। দাসদের প্রতি পাশবিক আচরণের যে মর্মান্তিক ধারা জাহেলি যুগে খুব স্বাভাবিক ছিলো, তার পথ তিনি চিরতরে বন্ধ করে দেন। কুরআনে দাসমুক্তির জন্য জারি হয় সহজ ও সোজা বিধান।

নবীজি দাসদের অধিকারের ব্যাপারে বলেন, 'তোমাদের দাস তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই, যার ভাই তার অধীনে আছে, সে যেন তাকে সে-ই খাবার দেয়, যা সে নিজে খায়; নিজে যে কাপড় পরিধান করে, তাকেও সে কাপড় পরিধান করায়। সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোনো ভার চাপিয়ে দিবে না। যদি চাপিয়ে দাও, তাহলে তাদের সহযোগিতা করো।' (সহিহ মুসলিম, হা.১৬৬০)

একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. তাঁর দাসকে মারলেন। তারপর দাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি?' দাস বললো, 'না।' ইবনে ওমর রা. বললেন, 'আজ থেকে তুমি স্বাধীন।' এরপর ইবনে ওমর রা. কিছু মাটি হাতে নিলেন। বললেন, 'এই যে

দাসকে মুক্ত করলাম আমি, এই মুক্তির জন্য আমি এই মাটি বরাবর সওয়াবও পাবো না। আমি তো নবীজিকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি তার দাসকে অপরাধের চেয়ে বেশি প্রহার করলো, তার প্রহারের কাফফারা তাকে মুক্ত করে দেওয়া।'

(সহিহ মুসলিম, হা. ১৬৫৭)

সুওয়াইদ রা. বলেন, 'আমি একবার নবীজির সঙ্গে ছিলাম। আমি ছিলাম ভাইদের মধ্যে সপ্তম। আমাদের একটি দাস ছিলো। আমাদের একজন তাকে আঘাত করলে নবীজি দাসকে আজাদ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।'

নবীজি দাস-দাসীদের অধিকার ও মর্যাদার সীমা এতই উন্নীত করে দিয়েছেন যে, তিনি দাসদেরকে 'আমার গোলাম' বা 'আমার বাদি' বলে ডাকতে নিষেধ করেছেন মনিবদেরকে; বরং তাদেরকে 'আমার ছেলে' বা 'আমার মেয়ে' বলে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি, হা. ২৫৫২/ ফাতহুল কাদির ১/৬৭৩)

তাছাড়া ইসলামে দাসচুক্তি এমন কোনো ব্যাপার নয় যে, জীবনভর এই দাসত্বের বোঝা বইতে হবে; বরং ইসলামে দাসপ্রথা একটি সাময়িক চুক্তিমাত্র। কুরআনে এ ব্যাপারে আয়াত এসেছে—'তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীর মধ্যে যারা অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভের চুক্তি করতে চায়, তোমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখতে পাও।' (সুরা নুর, আয়াত: ৩৩)

ইবনে হাজম রহ. বলেছেন, 'কুরআনের আদেশসূচক আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, দাস-দাসী মুক্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে মনিবের জন্য তা করা অপরিহার্য। এটাই হলো শরীয়তে দাসপ্রথার ব্যাপারে নবীজির আদর্শ।

পশু-পাখির প্রতি দয়া

শুধু মানুষের প্রতি ভালোবাসা নিয়েই তিনি এই পৃথিবীর বুকে আসেননি, তিনি রহমতুল্লিল আলামিন—সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য তিনি রহমত ও দয়ার প্রতিরূপ হয়ে এসেছিলেন। সকল সৃষ্টির প্রতিই ছিলো তাঁর সমান দয়া। ফলে পাখিরা তাঁকে বুঝতো; নিজেদের অক্ষম ভাষায় ফরিয়াদ জানাতো তাঁর কাছে। তাঁর দয়া ও মমতার মখমলে উষ্ণতা পেতো বনের হরিণ, মরুভূমির উট। তাঁর জন্য কেঁদে জারজার হয়েছিলো মসজিদে নববীর খেজুরশাখা। মেঘেরা তাঁর জন্য উড়তো এক খণ্ড ছায়ার আরাম হয়ে। তাই কেউ জীবের প্রতি অন্যায় করলে তিনি মন খারাপ করতেন, কষ্ট পেতেন; রাগ করতেন, অভিশাপ দিতেন। জীব-জন্তুর অক্ষম কান্না তাঁকে ব্যথিত করতো।

নবীজি বলেছেন, 'একবার এক নারী একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিলো। আটকে থাকা অবস্থায় বিড়ালটি মারা যায়। এজন্যই ওই নারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো।'

(সহিহ মুসলিম, হা. ২২৪৩)

তিনি আরো বলেছেন, একবার এক লোক হেঁটে যাচ্ছিলো। পথে তাঁর খুব পিপাসা লাগে। সহসা একটি কূপ দেখতে পায় সে। তাতে নেমে পড়ে। পানি পান করে। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। হাঁটতে-হাঁটতে দেখে একটি কুকুর জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। লোকটি ভাবলো, তৃষ্ণায় একটু আগে আমার যেমন অবস্থা হয়েছিলো, কুকুরটারও তো সেই দশা। লোকটি আবার কূপে নেমে পড়লো। মোজা ভরে পানি তুললো কুকুরটির জন্য। তারপর ফিরে এসে পানিভর্তি মোজাটি কুকুরের মুখের সামনে ধরলো। কুকুরটি পানি খেয়ে খেয়ে পিপাসা মেটালো। আল্লাহ তাআলা এই লোকটিকে ধন্যবাদ জানালেন এবং লোকটিকে ক্ষমা করে দিলেন। (সহিহ বুখারি, হা. ২৪৬৬)

রাসূলের শোনানো এসব ঘটনা শুধু কাহিনি নয়; আগের যুগের কোথাও না কোথাও এগুলো বাস্তবে ঘটেছিলো। তিনি সেগুলোর বর্ণনা করতেন মাত্র।

প্রাণীদের হক আদায় করার ব্যাপারে নবীজি আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। একবার তিনি ক্ষুধায় পেট পিঠের সাথে মিশে যাওয়া এক উটকে দেখে বেদনাহত হন। তখন বলেন, 'এই চতুষ্পদ প্রাণীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এদের উপর ইচ্ছামাফিক আরোহী হয়ো না। ঠিকঠাক এদের খাবারের জোগান দিয়ো।' (সহিহ মুসলিম, হা. ২২৪৩)

আরেক হাদিসে নবীজি বলেছেন, 'যে বস্তুতে প্রাণ আছে, তাকে তোমরা লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না।'

(সুনানে আবু দাউদ, হা. ২৫২৬)

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করার শিক্ষা রাসূল মানবসমাজকে দেননি। বরং তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য এহসানকে আবশ্যক করে দিয়েছেন।'

শিক্ষণীয় বিষয়

আজকাল সমাজে কিছু মানুষ আছে, যারা পশু পাখির প্রতি অতি ভালোবাসা দেখান। এবং এটা করতে গিয়ে তারা কুকুর পোষেণ। সেসব নিয়ে থাকেন, ঘুমান। এটা হচ্ছে নবিজির পশু পাখির প্রতি ভালোবাসার কথা বলে মানুষকে মিসগাইড করা। এটা না। কুকুর পোষা তো জায়েয আছে। কিন্তু এসব নিয়ে ঘুমানো বা একসাথে খাওয়া তো নিষিদ্ধ। এজন্য নবিজির জীবনের সবটুকু জানা এবং বোঝা জরুরি। কেউ যেন আমাদের ব্যবহার করতে না পারে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা।

অনেকে আবার এত ভালোবাসা দেখায় যে, তারা কোন পশুর গোশত খায় না। এটাও একটা ট্রেন্ড এখন। তাদের দাবি, তারাও আল্লাহর সৃষ্টি। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তাদেরকে খাওয়া যাবে না। এটাও প্রকৃত শরিয়ত না বোঝার ফসল। অথচ, কোন পশু খাওয়া যাবে, কোনটা খাওয়া যাবে না এর বিধান স্পষ্ট। ফলে যারা আল্লাহর হালাল করা জিনিসকে হারাম মনে করে, তাদের জন্য কুরআনে হুঁশিয়ারি আছে। আমরা এই বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে নিব। কারো হাতের খেলনা হব না। আমাদের পরিচিতদের কেউ এই ভুলের স্বীকার হয়ে থাকলে দ্রুত তাকে ফেরানোর চেষ্টা করবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন আমিন।